Bindi Memsaheb

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED MATERIAL

বিন্দি মেমসাহেব

গার্গী ভট্টাচার্য

প্রতিটি বিন্দি মেমসাহেবকে

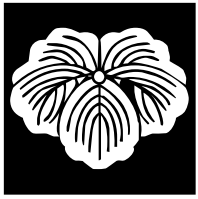

বিন্দি মেমসাহেব

বিন্দি মেমসাহেবের করুণ কাহিনী আমি শুনেছি পরবাসে থাকাকালীন । লেফ্রয় নামক এই দেশে সাদা মানুষের সাথে বাস করে কালো মানুষ । আদিবাসী । তাদের বলে মিশাল । সেই মিশাল উপজাতির মানুষ ছিলো বিন্দি মেমসাহেব । এই লেফ্রয় দেশটি ওদেরই দেশ ছিলো । পরে সাদারা, দলে দলে এখানে এসে কলোনি তৈরি করে । ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড হয়ে ওঠা লেফ্রয়; ক্রমে ক্রমে মিশালদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় দেশ জুড়ে । ওদের সন্তানদের কেড়ে নেওয়া হয় । তাদের সভ্য করার নামে

নানান সংস্থায় রাখা হয় । অনেক সময় বাবা ও মায়েদের হত্যা করা হয় । একসময় গণহত্যার কবলে পড়ে মিশাল উপজাতি । গাঢ় রং এর এই মানুষেরা, সৎ আর পরিশ্রমী । হঠাৎ দলে দলে সোনালী মানুষ- চলে আসায় তারাও বিব্রত । তারপর তাদেরই ভিটেমাটি কেড়ে নিয়ে তাদের উচ্ছেদ করার জন্য অনেকে সংগ্রামও করেছিলো । মারা গেছে বেশ কিছু দলনেতা । র‍্যাডিক্যাল লোকজন ।

বিন্দি মেমসাহেবের অবশ্যই এরকম কোনো রেবেলের সাথে যোগাযোগ ছিলো ।

নিজের একমাত্র মেয়ে তাতুম-কে নিয়েই শুরু হয় বিন্দির জীবন সংগ্রাম । সরকার পক্ষ তার মেয়েকে কেড়ে নিয়েছে সে অসভ্য বলে । তাতুমের মা এক বনমানুষ যার না আছে কোনো কালচার- না অর্থ । বর্তমান লেফ্রয় দেশের সাদা ও আধুনিক সমাজে তার মেয়েকে বড় করার মতন কোনো সম্পদই তার কাছে নেই । কাজেই আইন করেই যেমন এইসব শিশুদের কেড়ে নেয় সরকার সেরকম তার কুমাতা হবার কারণেই এই বাচ্চা মেয়ে তাতুম চলে গেছে কোন সে আধুনিক ডেরায় !

কালো মেয়ে তাতুমের মুখটা মিষ্টি । হাঁটতে পারতো । পরিষ্কার না হলেও অর্ধেক শব্দ বলতে সক্ষম ছিলো । সেই তাতুমকে কেড়ে নেওয়া দিয়েই শুরু এই যুদ্ধের ।

নিজ স্বামীকে হারায় বিন্দি, সাহেবদের সাথে সংঘর্ষে ।

প্রাণে মেরে ফেললো ওর মেয়ের বাবা নিম্বিয়াকে , সাদা লোকেরা । নিম্বিয়া বুঝতেই পারেনি যে কোন অপরাধে এই ভিনদেশী লোকেরা তাদের শিশুদের কেড়ে নিচ্ছে ! নিজের দেশে খেয়ে পরে বেঁচে আছে ওরা । নিম্বিয়া, বিন্দিরা । তাতুমেরা । হঠাৎ এই শকুনের দল কোথা থেকে এসে হাজির হল আর কেনই বা ছোঁ মেরে সব নিয়ে নিলো ?

ওরা ঈশ্বরকে বলে ডোক্‌লু । নিম্বিয়া ভাবে যে ডোক্‌লু ব্যাটা নাকি সব তৈরি করেছে । আর নিজে আড়ালে বসে মজা দেখছে । এই যে শত শত শিশুরা গৃহহীন হচ্ছে , অনাথ হচ্ছে তাতে কৈ ডোক্‌লুর তো কিছু যায় আসছে না ! ঠাকুর বোবা তা জানতো নিম্বিয়া । কিন্তু এখন দেখছে যে সে শুধু বোবা নয় , অন্ধও । আর বোধকরি ঘুষও নেয় । তা নাহলে সমস্ত ধনী ও শক্তিমান মানুষেরা সবার ওপরে ; অন্যায় করেও বেঁচে যায় । আর তাতুমকে কেড়ে নেওয়া তার বাবা-মায়ের

বুক থেকে- যে চরম অপরাধ কৈ সেটাতে তো ডোক্‌লু কিছু করছে না !

আগে ডোক্‌লুকে খুব ভালোবাসতো নিম্বিয়া । এখন ভুলেও ওকে স্মরণ করেনা । কারণ নিম্বিয়া দেখেছে যে ডোক্‌লু খালি ধনীদের সাহায্য করে ।

আবার সাদারা যীশু বলে কাকে নাকি এনেছে ! সে ওদের ডোক্‌লু । তার জন্য গীর্জা গড়ছে, মিশালদের জমি কেড়ে নিয়ে । বাপ্‌-দাদার জমি জুড়ে বসছে যীশু ডোক্‌লু ।

এরপরে মিশালদের হিশু করার জায়গাটাও বুঝি রইবে না ! এই নাকি স্বদেশ, স্বভূমি, স্বজনের কোলে বসবাস !

যীশুর ; মানে সেই দেবতার- তার আবার নাকি অপমৃত্যু হয় । নিম্বিয়ার মনে হয় যে সে এখন অপদেবতা হয়ে এই দেশে এসেছে তান্ডব চালাবে বলে ! আর হচ্ছেও তাই ।দেখা যাক্‌ তাদের হয়ে কেউ গলা ফাটায় নাকি । এতদিন অবধি অনেকে গলা উঁচু করেছে কিন্তু সবাইকে সাদারা মেরে ফেলেছে । তীর নিয়ে কী আর বন্দুকের সাথে এঁটে ওঠা যায় ? সাদা ফ্যাটফ্যাটে মানুষগুলির সারা দেহে বাদামি কিংবা লাল লাল দাগ । চুল সোনালী, কালো । চোখের মণি

নীল, সবুজ আর হল্কা হলুদ । মনগুলো ভালো না । দস্যুর মতন !

তাতুমকে যেমন সে মানে বিন্দি হারালো সেরকম অনেকে তাদের স্ত্রীদেরও হারায় এইসব বদমাইশের হাতে । ধরে ইজ্জৎ নিয়ে নেয় একেবারে । সুযোগ পেলেই ইজ্জৎ লোটে ।একেবারে গুন্ডারাজ চলছে আর কি !

পরে তো নিম্বিয়াও মরলো , ওদের গুলিতেই ।

আর তখন থেকেই বিন্দির ওপরে নজর পড়লো -থিওর । থিওডোর ।

সাদা মানুষ । আইনের রক্ষক । একা থাকে বিন্দির এলাকায় । এখানে নাকি মিশাল জনজাতির ভালো করার জন্য আছে । ওর বাসাটা কাঠের । ঘোড়ায় করে সব জায়গায় যায় । পাখি, হরিণ আর শূকর মেরে খায় । অবসরে মাছ ধরতে যায় । সমুদ্র নাকি ওকে ডাকে ।

বিন্দির ডেরাটা আসলে একটি দ্বীপ । লেফ্রয় দেশের অংশ বটে তবে দ্বীপ আর কি ।

লোকটা দিনের বেলায়- সূর্যের নিচে খালি গায়ে , লেংটি পরে শোয় । ওদের মেয়েরাও অল্প পোশাকে রোদে শুয়ে থাকে । যাদের চোখে দৃষ্টি কম তারা চশমা

পরে । বিন্দির গোষ্ঠীর মানুষেরা চোখে কম দেখেনা । ওরা ছালিয়া খায় । এক জাতের গাছের ছাল । এতে কেউ চোখের দৃষ্টি হারায় না । আর ঢ্যাম্না মাছ খায় । এই মাছ সমুদ্রে থাকে । অনেক সময় পাড়ে এসে আটকা পড়ে যায় । ঢ্যাম্না মাছ , চোখের জন্য খুব ভালো । এইসব খেতে বিন্দিরা অভ্যস্থ তাই ওরা চশমা নেয়না । খালি চোখেই সব দেখে । দূর দূরান্তের জিনিস । কেবল মেয়েটাকে কোথায় নিয়ে গেছে এটা যদি দেখতে পেতো !

স্বামী হারানোর শোকে ভাসার সময় নেই । মেয়েকে নিয়েই মন মশগুল্ । এমন সময় থিওর স্পর্শ মনকে শান্তি দেয় । থিও নাকি এইসব লোকেদের খুব ভালো করেই চেনে যারা বিন্দির মতন মায়ের কোল থেকে শিশুদের নিয়ে যায় । আর ওর কাছে নাকি মোটা মোটা খাতা আছে যাতে এদের ঠিকানা আর হদিস্ লেখা আছে । সেখান থেকেই সে বার করবে যে তাতুমকে ওরা কোথায় নিয়ে গেছে । আসলে বাচ্চাগুলোর মঙ্গলের জন্যই এমন করা । ওরা যাতে আধুনিক সমাজে বেড়ে ওঠে আর সুস্থভাবে মানুষ হয় তাই সরকার এমন আইন করেছেন । নাহলে বিন্দিরা তো চশমার কথাই জানতো না ! দুনিয়া কত এগিয়ে গেছে

আর মিশালরা কোন যুগে পড়ে আছে সেটাও দেখতে হবে তো ! ডোক্লু হয়ত এই কারণেই সাদাদের এই লেফ্রয় দেশে যাকে মিশালরা বলে হিদা -- সেখানে পাঠিয়েছেন ।

যদিও থিও বলেছে যে সে, সাদাদের- জোর করে সবাইকে যীশুপন্থী করার ব্যাপারে সায় দেয়না । ডোক্লুর অর্চনা আর করা যাবেনা । সবাইকে এখন থেকে যীশু ভজনা করতে হবে । থিও এর প্রতিবাদও নাকি করেছে । আসলে সে এক গীর্জার সাথে জড়িয়ে আছে । তাই বলেছে যে ওপর মহলে কথা বলে ; এই সবার ডোক্লু ভজনার অধিকার কেড়ে নেওয়া-জিনিসটাকে বন্ধ করবে । **যেমন এনে দেবে বিন্দির মেয়ে তাতুমকে !**

বিন্দি তো ওকে বিয়ে করেনি । বিধবার বিবাহ মিশালরা স্বীকার করে । কিন্তু থিওকে, বিন্দি বিয়ে করেনি । তবুও ওরা একসাথে থাকে । থিও , বিন্দির সব পেয়েছে । মন ও দেহ । ওরা স্বামী -স্ত্রীর মতন বসবাস করে । থিও-র জন্য কাঁদে বিন্দি সে বিদেশে গেলে । আবার থিও তার জন্য নিয়ে আসে বহুমূল্য সমস্ত উপহার, গয়না ।

এইভাবেই ঘনিষ্ঠতা বেড়ে চলে । একদিন সত্যি সত্যি মহামানব থিও নিয়ে আসে তাতুমকে । অবশ্যি মেয়েটা ততদিনে অনেকটাই বড় হয়েছে । রংটা মনে হচ্ছে একটু ময়লা হয়ে গেছে । হয়ত সভ্য হবার চাপে । আর কথাও এখন কট্‌কট্‌ করে বলছে ।

মেয়েকে বুকে নিয়ে কত কাঁদলো বিন্দি ! ওকে পেয়েছে ডোক্‌লুর কৃপায় আর এবার তাকে সুন্দর করে মানুষ করবে ! ভয় কি? থিও তো আছে !

আধুনিক কায়দা শিখবে তার কাছে আর বিন্দি দেবে বুক ভরা মায়ের স্নেহ ।

অনেক পড়াবে মেয়েকে , বিন্দি । দরকার হলে সে চশমাও কিনে দেবে । আর বড় হয়ে মেয়েটা সাদাদের সমাজে আদর পাবে । নিজের মায়ের মতন তাকে মাটিতে বসতে হবেনা । টেবিলে বসে, সে কাঁটা চামচ দিয়ে খাবে । চুমুক দিয়ে নয়, ওদের মতন করে স্যুপ্‌ খাবে । কাপে ভরে নিয়ে কফি খাবে । বাটিতে নয় ।

আর তখন গর্বে বুকটা , কত্তো ফুলে উঠবে বিন্দির!!!

থিওকে এই ব্যাপারে সব বললো বিন্দি । থিও-ও মহা খুশী । বললো :: কাল থেকেই শুরু করে দে । কোনো কাজে দেরী করতে নেই । কাজ হয়ে গেলে তখন আনন্দফূর্তির জন্য, অনেক অনেক সময় পাওয়া

যাবে । কাজেই আর বিলম্ব নয় । যত বেশি সময় দিবি তত ভালো মানুষ হবে । সড়গড় হবে আদব কায়দায় । মনের ভয়টা চলে যাবে । সাহস আসবে । সাহেবরা বিচিত্র কোনো জীব নয়, তারাও যে একধরণের মানুষ সেটা ছোট থেকে বুঝে- তাতুম আরো শক্তপোক্ত আর স্মার্ট হবে তার অন্তরে ।

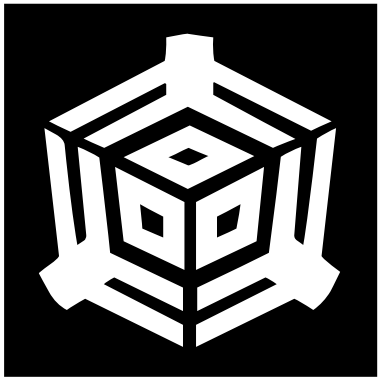

আজকাল বিন্দিকে লোকে মেমসাহেব বা মাদাম্ বলে সম্বোধন করে । এগুলো নাকি থিওর সমাজের রীতিনীতি । অর্থাৎ যথেষ্ট সম্মান পাচ্ছে বিন্দি, থিওকে বিবাহ বন্ধনে না বেঁধেও । সাদাদের সামাজিক নিয়ম কানুন শেখায় ওকে থিও । অল্প অল্প ইংলিশও পারে আজকাল বিন্দি । মেমসাহেব বলে কথা !

চুলে আগে ফুল লাগাতো । এখন সেগুলো ফুলদানিতে রাখে । কানে, নাকে, পায়ে গয়না পরতো । এখন কেবল একটি আংটি পরে । চুল কেটে ফেলেছে । কাঁধ পর্যন্ত ওর চুল । পোশাকও আধুনিক । স্কার্ট আর ব্লাউজ । **আগে খালি গায়ে ছিলো । বক্ষবন্ধনী আর কোমড়ের নিচে একটা কাপড় পরা ।** এছাড়া এখন সে ফল , বাজার থেকে কিনে এনে খায় । আগে গাছে উঠে ফল পেড়ে খেতো । আর পিরিয়ড হলেও এখন লোকের সামনে যায় । আগে শুয়ে বসে ঐ কটা দিন কাটাতো । ওদের বাসার থেকে দূরে ; একটি একচালার ঘরে । সেটাই ওদের নিয়ম । কত বদলে

গেছে বিন্দি ! আর ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে ওর একমাত্র মেয়ে , তাতুমও । সেও সভ্য হচ্ছে সাদাদের মাপকাঠিতে ।

সাদারা ; কেন শিশুদের কেড়ে নিয়েছে ? আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য । কোনো মন্দ ফন্দিতে নয় । বলেছে থিও । থিও এও বলেছে যে এইসব শিশুদের লেখাপড়া শিখিয়ে- সমাজের উপযুক্ত করে ছাড়বে সরকার । যাতে তারা সুন্দর জীবন কাটাতে পারে । হীনমন্যতায় না ভুগে । এও কী কম কথা ?

ওদের মঙ্গল চায় বলেই তো এমন সব ব্যবস্থা !

আর থিও, যেদিন থেকে মিশাল কন্যা তাতুমকে খুঁজে এনেছে, সেদিন থেকেই বিন্দি ওকে ডোক্‌লুর আসনে বসিয়েছে । থিও হল বিন্দির ঈশ্বর ।

বিন্দির একটা আজব স্বভাব আছে । কোনো লোককে দেখলে, তার সাথে একটা রং দেখা । থিওর সাথে সে

সবসময় সোনালী দেখেছে আর এখনও দেখে । অর্থাৎ সে মানুষ হিসেবে খুবই দামী । তাই সোনালী । আগে বিন্দির কিছু জড়তা ছিলো । পরে সব কেটে গেছে ।

সামনাসামনি , এমন কি শয্যায়ও !!!

তাতুমও আস্তে আস্তে থিওকে নিজের বাবা বলে ভাবতে শিখছে । আর হবেনাই বা কেন ? জন্ম দিলেই তো আর কেউ বাবা হয়না , ভরণ পোষণ ও রক্ষা করার দায়িত্ব যে নিতে পারে বা নেয় সেও জৈবিক বাবার চেয়ে কোনো অংশে কম নয় ।

অনেক বছর পেরিয়ে গেছে । মূল ভুখন্ডের এক বড় শহরে, একটি কালো মেয়ে দেওয়াল লিখন নিয়ে রিসার্চ শুরু করেছে । দেওয়াল লিখনের মধ্যে থাকে এক একটি মহাকাব্য । কত মানুষের বর্ণ পরিচয় হয়েছে এর জন্য । কত বড় বড় মানুষ এই ক্ষুদ্র জিনিসকে আঁকড়ে- ঘটিয়েছেন এক একটি বিপ্লব । কত শিল্পীর প্রাথমিক ক্যানভাস হয়ে ধরা দিয়েছে এইসব দেওয়ালের চিত্র , লিখন । এইসব নিয়ে ভাবার আছে এইভেবে ; একে নিজ গবেষণার বিষয় করে সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রী লিয়া । লিয়ার গাত্রবর্ণ কালো হলেও সে এক থাই পরিবারে বেড়ে উঠেছে ।

তার বাবা ও মা, থাইল্যান্ড থেকে এখানে মানে লেফ্রয় দেশে আসে । তখন ওরা এসেছিলো সাংবাদিক আর শিক্ষিকা হয়ে । পরে মূল সমাজে মিশে যায় । নিজেদের দুটি সন্তান । আর লিয়াকে ওরা সরকারের কাছ থেকে পেয়েছে । দত্তক নিয়ে মানুষ করে তুলেছে । লিয়া নিজের বাবা ও মায়ের ঠিকানা আর নাম

জেনেছে সরকারের পুঁথি থেকে । এই এত্তো মোট্টা বই একখানা । সেখানে সবার নাড়ি নক্ষত্র লেখা আছে ।

লিয়ার ইচ্ছে আছে একবার পেরেন্টদের সাথে দেখা করার । জানতে চায় যে কোন অপরাধে নিজের বাচ্চাকে তারা- সরকারের কাছে দিয়ে আসে । কারণ সরকার তাদেরকেই গ্রহণ করেছেন যাদের বাবা ও মা তাদের ফেলে দিয়েছিলো । কাজেই লিয়ার অনেক কিছু জানার আছে ।

ওর বাবা ও মায়ের ছবি সে দেখেছে সরকারের ফাইলে । ওর মাকে ওরই মতন দেখতে । এখন হয়ত বুড়োটে দেখাবে । তবে মুখটা লিয়ার মতন । রং ময়লা । একটু রোগাটে । মাথায় তার ঘন কালো চুল !

চুলে ফুল গোঁজা । আর পরণে কেবল স্কার্ট এর মতন, আরো লুজ্ একফালি কাপড় আর বক্ষবন্ধনী।ওর বাবাকে দেখতে বীরপুরুষের মতন । খুব হাসছে , ছবিতে । সরকার যদি ওদের দু:খ দিয়ে ফটো নিতো তাহলে কী আর ওরা এত হাসতো ? কাজেই বোঝাই যাচ্ছে যে লিয়াকে ওরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো । পরম দরদী ও করুণাময় সরকার পক্ষ ঠিক তখনই ওকে বুকে তুলে নিয়েছে । আর পরে কোলে তুলে নিয়েছে ওর বর্তমান পেরেন্টরা । অন্য দুই সন্তানের সাথে । সেই দুই বাচ্চার মধ্যে একজন, নাম ফার্দি তার সে

লিয়াকে বলেছে ::: হ্যাঁ রে ! তুই কেন খামোখা এইসব ঝামেলায় জড়াতে চাইছিস্ ? তোর বাপ্ মা কি আর তোকে স্বীকার করেছে যে আজ বুকে তুলে নেবে বা তোর সব প্রশ্নের জবাব দেবে ?

তোর শিক্ষার বিষয় যদিও সমাজ-বিজ্ঞান তবুও ওসব থিওরি দিয়ে পুঁথি বিক্রি হয়, বাস্তব জীবন চলেনা । দেখনা ,যদি চলতো তাহলে তো ওরা তোকে বুকে নিয়ে বাঁচতো । সামাজিক নিয়মেই । তোকে এইভাবে কুকুর বেড়ালের মতন, অচেনা সরকারের হাতে তুলে দিতো কি ? তুই ভালো পরিবার পেয়ে গেছিস্ , যদি না হতো তাহলে কী হতো তোর অবস্থা ?

সত্যি তো, এটা ভাবার বিষয় তবুও মন যে চায় একবার নিজ শিকড়ের হদিস্ পেয়ে সেই বৃক্ষকে পর্যবেক্ষণ করতে । কোন সে গাছ যার ফল আমি , বিষবৃক্ষ নাকি সতেজ গাছ ? নাকি সেই মহীরুহ অনবরত ঝরাচ্ছে অরণ্যে রোদন ? জানতে ইচ্ছে করে খুব ।

অন্য কোনো ভুবনে তো নয়, এই দেশেই তারা আছে কাজেই একবার গেলে মন্দ হবেনা । ও প্রস্তুত হয়েই যাবে । ওকে অপমান ও লাঞ্ছণা সইতে হবে মনে করে

। হয়ত মারধোরও দিতে পারে । অসভ্য জনজাতি বৈ তো নয় ! ওরা খুব ভোকাল্ আর ফিজিক্যাল হয় । ভদ্রতার ধার ধারেনা । হয়ত ওর বাপ্ই ওকে ঠেঙিয়ে দেবে একেবারে । কে জানে !

এক বান্ধবী যে খুবই মুখরা ; সেতো বলেই ফেললো যে দেখিস্ মারধোর অবধি ঠিক আছে , তোকে আবার রেপ্ না করে দেয় তোর বাবা !!!

আর লিয়া নানান আশঙ্কা নিয়েও স্থির করলো একদিন যাবে সেই ভুবনে । যেখানে পাতা আছে তার উৎপত্তির গালিচাখানি । তার ; জগতের প্রথম আলো দেখার সাক্ষী একটি কাপড়ের ফালি যা হয়ত কোনো এক দাইমা রেখে দিয়েছে নিজ আঙিনায় । লিয়ারই জন্য । আর ওর মা , যাকে সে মাতৃত্বের স্বাদ দিয়েছিলো ।

রেপ্ কাকে বলে ? ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা । তাই তো ? কিন্তু কেউ যদি নিজের ইচ্ছেয় তার বাবার সাথে শয্যা ভাগ করে নেয় তাহলে তাকে তো কেউ রেপ্ বলবে না ?

ভাবো তো একটি কিশোরী , তার বাবাকে বলছে যে তোমার প্রাইভেট পার্টস্টা মানে তোমাদের ছেলেদের এই দৈহিক অংশ এত জবরজং কেন ?

মা তো হয় মেয়েরা ! তাহলে তোমরা কেন এত যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘুরছো ?

ঠিক এরকমই বলতে অভ্যস্থ ছিলো তাতুম । নিজের পালিত পিতা থিওডোরকে ।

থিওকে ভগবানের আসনে বসালেও সে আদতে ছিলো কামুক ও লম্পট । তাই বিন্দি স্বামীহারা হলে ; তাকে নিশানা বানায় -একটি নেটিভ মেয়েকে ভোগ করবে বলে । ওকে তখন সবাই বলেছিলো যে একে যেন সে

বিয়ে না করে । কারণ তাহলে ব্লাডে ঢুকে যাবে । বংশে এসে যাবে ।

তখন থিও বলে :: ক্ষেপেছো ? কুকুরকে আদর করা মানে তো তাকে বিয়ে করা নয় । একটা বিচ্‌কে তো আমি বিয়ে করতে পারিনা !!

সেই থিওডোর ; নিজ বাহুডোরে বাঁধে কিশোরী তাতুমকে । এই যে তাতুম এখন মা হতে চলেছে তা তো ওদের প্রেমের কারণেই ! আর বাইরের একগাদা বয়ফ্রেন্ড থেকে যৌন অসুখ আসতে পারে । ঐসব ছেলেরা তার কোমল মেয়েকে নিয়ে কোমল গান্ধার না করে পিটিয়ে ছাতুও তো করতে পারে ? মেয়ের একটা সিকিউরিটির ব্যাপার আছে না ? তার ওপর আছে আজকাল অচেনা পুরুষের সাথে যুক্ত হয়ে মৌলবাদী হবার ভয় !

কাজেই যা করেছে থিও তা তো ওর মঙ্গলের জন্যই ?

ওকে বাঁচাবার জন্য ; সমাজের নির্মম থাবা থেকে !

কেবল বিন্দি জানেনা । তাতে কী ? ও তো আর সত্যি সত্যি তাতুমের বাবা নয় আর বিন্দিও ওর বিয়ে করা বৌ নয় ।আসলে কোনো রক্তের বা আইনের সম্পর্কই

নেই তাতুমের সঙ্গে । কাজেই ওরা স্থির করেছে যে ওদের সন্তানের নাম দেবে লিও । মানে সিংহের মতন । একা থাকে , মেজাজে থাকে । লিও-র সাথে হয়ত চট্ করে কেউ মিশবে না । তাতে কী ? সিংহ তো রাজাধিরাজ । জনসমুদ্রে তো সে গা ভাসায় না !

এক নেটিভ লোক, যে কালাজাদু জানে সে নাকি নাড়ী টিপে বলেছে যে এই সন্তান ছেলেই হবে । মেয়ে হলে অবশ্য থিও ওর গলা টিপে মেরে ফেলবে । আবার চেষ্টা করবে ছেলের জন্য , তাতুমের সাথেই ।

বিন্দির হয়ত শুনলে খারাপ লাগবে । তাতে থিও কী করবে ? বিন্দি ওর আশ্রিত নাকি ও বিন্দির ?

আশ্রয়দাতার খেয়ালিপণা- তো বিন্দির মতন নেটিভ এক মহিলাকে সহ্য করতেই হবে !

আর পশুদের দেখো ! ওরা সবার সাথেই মজে যায় । মানুষ ; সভ্য হতে গিয়েই যত বিপদ্ ডেকে আনলো । আর সত্যি বলতে কী, তাতুম ওর পাতানো মেয়ে মাত্র । ও তার জন্মদাতা বাবাও নয় আর আইনের প্যাঁচে পড়া পালিত বাবাও নয় । আর শৈশব থেকেই তো তাতুমকে মলেস্ট করছে , থিওডোর !

লোকে শুনলে বলবে আরেকটা পেদোফাইল- এই তো? তা ওর তো পেদোফাইলদের মক্কা, গীর্জার সাথে

যোগ আছে । মেয়েটা আগে আপত্তি করতো কিন্তু যেদিন থেকে ওর আরাম লাগতে শুরু করলো সেদিন থেকে ও আর আপত্তি করেনি । এখন তো বলে যে থিও ছাড়া কাউকে সে বয়ফ্রেন্ড বলে ভাবতেই পারবে না । থিওর মতন কেউ ওকে বোঝেনা , আনন্দ দিতে পারবে না । আর ও অন্য কারো কাছে নিরাপদ নয় । তাতুম স্থির করেছে যে ওর মা বিন্দি মেমসাহেব যদি ওদের সম্পর্ক মেনে নেয় তাহলে ভালো নাহলে ওরা অন্য কোথাও গিয়ে বিয়ে করবে । মাকে নাহয় কোনো ওল্ড পিওপেল্স্ হোমে রেখে আসবে । মৃত্যুর পোশাক পরিয়ে ! মা তো নিজের প্রথম সন্তানকে এই দুনিয়ার আলো দেখিয়েছে আর তাতুম দেখাবে না ?

থিও ওর হবু বর আর তাই ও থিওর বিয়ে করা বৌ হবে । ওরা যীশু মতে বিয়ে করবে । ওসব নেটিভ ডোক্লু -ফোক্লু পন্থায় নয় ।

এখন দেখা যাক্ বিন্দি এই ঘটনা জানার পর কি করে !

--মম্, ডোন্ট বি মিন্ ওকে ! ফর গড্স সেক্ প্লিজ ট্রাই টু অ্যাক্সেপ্ট নিউ থিংস্ !

আদম বেনিংস্ এক যুবক । লিয়ার বন্ধু । কলেজ জীবনের বন্ধু । আদম ভারি ভালোমানুষ । আর খুব জ্ঞানী । কাজ করে অবশ্য এক হার্ডওয়্যার এর দোকানে । বিরাট দোকান । সেখানে ও সেল্স-এ কাজ করে ।

আদমের ইতিহাসটা একটু অদ্ভুত । ওর বাবা পিয়ার্স বেনিংস্ -একজন যুদ্ধবন্দী হয়ে এক দেশে যায় । ওদের শত্রু দেশ সেটা । সেখান থেকে পালিয়ে পিয়ার্স এইদেশে আসে । একবার ওদের কয়েকজন বন্দীকে নিয়ে একটি প্রিজন ভ্যান জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় হাতির পায়ের নিচে পড়ে যায় । সেখান থেকে দুজন পালাতে সক্ষম হয় । একজন পিয়ার্স আর অন্যজনের নাম সিজার ।

ঘন বনের মধ্যে দুজন কিছুদিন ফলমূল খেয়ে দিন কাটায় । তারপর মাইলের পর মাইল হেঁটে ওরা সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছায় । বন থেকে সমুদ্রের গর্জন শোনা যেতো । আর ওরা ভ্যানে করে যাবার সময়ও সমুদ্র কিনারা দিয়ে এসেছে । কাজেই সমুদ্র কাছেই সেটা অনুমান করতে পারে । তাই পথভ্রষ্টদের মতন অজানার হাতছানিতে হেঁটে হেঁটে, ওরা সাগরপাড়ে যায় । সমুদ্রে দুদিন কাটে কোনো জাহাজের অপেক্ষায় । কিন্তু নাহ্ ! এই তটরেখা ধরে কোনো জাহাজ যায় না । অবশেষে ওরা একটি প্রাইভেট হেলিকপ্টারের নজরে পড়ে । সেই চালক ওদের নিজের বাসায় নিয়ে তোলে ।

হেলিকপ্টারে চড়ে ঐ ধনী মালিক তখন পড়শী দেশ ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলো । যা পিয়ার্সের শত্রু সেই দেশটি । কাজেই হাতে চাঁদ কেন নক্ষত্র পেলো ওরা ।

এবং সেখান থেকেই নাম বদলে ওরা দুজনে সমাজের মূলস্রোতে মিশে যায় । সেনাদলের লোকেরা জানে যে সব বন্দীরাই ঐ দূর্ঘটনায় মৃত । অথবা হস্তীর পদপিষ্ঠ ।

সেই লোকটি, যে ওদের নিজের বাড়ি নিয়ে যায় তার একটি সুবিশাল ফার্ম ছিলো । সেই খামারবাড়িতেই ওরা কাজ শুরু করে । বাড়িটি এমন নির্জন স্থানে যে

মনে হয় -চারপাশের ঘন বন তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে। জংলী জানোয়ার আর সাপখোপ হল অনাহুত অতিথি । জায়েন্ট স্পাইডার যা সাপ ও মৎস্য ভক্ষণ করে, তা থেকে শুরু করে অচিন সমস্ত পাখি ওদের সঙ্গী হতো সেখানে।

আবার নতুন জীবন শুরু করে পিয়ার্স । পরে খামারবাড়ির ছোট মেয়ে রবিন্ কেই বিয়ে করে । তার দোস্ত , সিজার বিয়ে করে রবিনের এক নীলনয়না বান্ধবীকে, পিলো টক্ করে করে। পরবাসে সব চলে।

ফার্মহাউজ রোমান্সে মেতে উঠেছিলো এই দুজন যুদ্ধবন্দী ভিনদেশী । খামারবাড়ির ভ্যাড়া ও গরু চুরি বন্ধ করা আর লাঠি চার্জ করে দুস্কৃতি হটানো তে পিয়ার্স ও সিজার দক্ষ ছিলো । কাজেই মালিক ওদের দুজনকে খুবই পছন্দ করতো । পিয়ার্স একদা নাকি একটি চিতাবাঘ মেরেছিলো ঐ ফার্মে । সেই চিতার লাশ অনেকদিন পড়ে ছিলো ওদের উঠোনে । গ্রামবাসীরা দেখতে আসতো । দলে দলে । এক ভিনদেশী এই বাঘ মেরেছে। পরে তার নাম হয়ে যায়

লেপার্ড কিং।

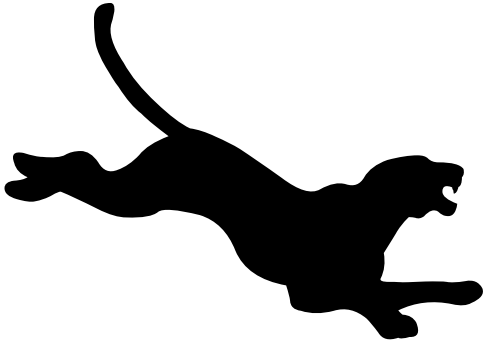

আদমের জন্ম ঐ ফার্ম হাউজেই । ওর মা রবিন খুব দরদী মহিলা । ওরা চার ভাইবোন । সবাইকে ওদের মা নিজ হাতে মানুষ করেছে । আয়া না রেখে ।

নিজে একটি সসের ফ্যাক্টরি চালাতো । সেখানে মেয়েরা বিভিন্ন ধরণের সস্ তৈরি করতো । শুধু মেয়েদের কাজে নেওয়া হতো । সব কর্মী ছিলো মেয়ে । দরোয়ান থেকে শুরু করে অফিসার অবধি । মেয়েরা গর্ভবতী হলে তাদের তাড়িয়ে না দিয়ে মাইনে দিয়ে ছুটি দেওয়া হতো এই শর্তে যে পরে অনেক কাজ করবে । যখন শিশু সাবলীল হবে । আদমের মায়ের সস্ কারখানায় অনেক নতুন নতুন বুনো ফলের সস্ এর সৃষ্টি হয়েছে যা উপাদেয় ।

ওদের ফ্যাক্টরিতে নাকি বেশির ভাগই আদিবাসী মেয়েরা কাজ করতো । তাদের কাছ থেকে শিখে নিয়ে ওরা সেখানে হানি বি ভেনম্ নিয়ে পর্যন্ত চর্চা করতো । নানান অসুখে বিসুখে আদিবাসীরা এই ভেনম্ কাজে লাগায় । রূপচর্চাতেও নাকি লাগে ।

আদমের মা রবিন, এই ভেনম্ নিয়ে কাজ শুরু করে ওদের সস্ কারখানায় । অবশ্য এক মহিলা এতে অসুস্থ হয়েও পড়ে । এই বিষের সঞ্চার হয় তার দেহে ফলে তার নাকি একটা দিক্ অসাড় হয়ে যায় । যদিও চিকিৎসক সঠিক জানেনা কেন এমন হল তবুও লোকের বিশ্বাস যে ঐ বিষের প্রকোপে ঢাকা পড়েই এক মহিলা যার নাম শিশা -- এই অসাড় অসুখের কবলে পড়ে । শিশার একটা দিক্ চলে না । সে অর্ধউন্মাদ । সারাটা দিন পথে পড়ে থাকে বা ঘুরে বেড়ায় ঝলমলে সস্তার জরি মাথায় পরে আর কান ও হাতে জড়িয়ে । ও নাকি খুব সাজতে ভালোবাসে । তাই এমন সাজ তার । অত্যন্ত জোরে খিলখিলিয়ে হাসা এই রমণী যদিও অর্ধউন্মাদ তবুও লোকে ওকে করুণা করে কিছু ভিক্ষা দেয় । সেগুলি একটি বাক্সে ভরে সেই বাক্স টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলাফেরা করে শিশা । লোককে শাপ শাপান্ত, বাপ্ বাপান্ত করা এই মহিলা ভীমরুলের চাক দেখলেই ঢিল মারে আর আক্রান্ত হয় তাদের হাতে । বড় বড় বিষফোঁড়ার মতন কামড় আর অজস্র র‍্যাশে ভরে ওঠে তার দেহ । উন্মাদিনী তবুও মরে না ।

কাজ করতে করতে হঠাৎ কেউ দেখে ফেলে ওকে । খিলখিল করে হাসছে , একদম একশো ভাগ পাগলদের মতন । ওর কাছে গেলে মানুষকে ও গুঁতো মারে । আর Bee দেখলে তাড়া করে ।

শিশার বিয়ে হয়নি । কে আর ওকে বিয়ে করবে ?

ও খামারবাড়িতেই থাকে । রবিন তার দায়িত্ব নিয়েছে । কোথায় যাবে এই অভাগিনী ? তার নয়নতারায় আজ মেঘ হলেও একদিন সে ওদেরই ছিলো । তাই মেয়েদের ব্যারাকে সে থাকে - তবে অনেক সময় পথেও শুয়ে পড়ে । প্রায় সব মহিলা কর্মীরই বয়ফ্রেন্ড আসে ঐসব ব্যারাকে । রাত্রি যাপনের জন্য । কিন্তু শিশার কেউ আসেনা । ও নিজে কিন্তু বনবালা । তবুও ওদের কমিউনিটির কেউও ওকে গ্রহণ করেনি । বিষ সঞ্চারের আগে এক পুরুষ মানুষ ওর কাছে আসতো ।

সে এখন ওকে ছেড়ে গিয়েছে । ওর মাথার ব্যামো আর বিষ র‍্যাশ--- ওকে সেই মানুষটির কাছে অযোগ্য করেছে ।

আদমের মা ; ওদের ভাইবোনেদের সবাইকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলো । নিজ হাতে মানুষ করেছে বলে সবার সাথেই তার মমত্বের সম্পর্ক ছিলো ।

এদের মধ্যে আদমের বড়দা, কিথ্- বিয়ে করেনি । সে কোনো কাজও করেনা । ওকে মা, অনেক কাজে ঢুকালেও সে দু একদিন কাজ করে সব ছেড়ে দেয় ।

তার কোনো কাজে মন বসেনা । তাই ওর বাবা ও মায়ের অবর্তমানে ওদের ফার্মের দায়িত্ব নেবে ওর ছোড়দা ড্যান আর বোন , হেলেনা । কারণ আদম এইসব কাজ করবে না বলে জানিয়েছে । ও লেখাপড়া করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে । এইসব ব্যবসা ইত্যাদিতে তার মন নেই । সে ইন্টেলেক্চুয়াল কাজ পছন্দ করে ।

ওর মা অবশ্য ওকে জোর করেনি কিন্তু এও বলেছে যে ফার্মে যারা গতর খাটায় তুমি তাদের মধ্যে থেকেই এসেছো । আজ যেখানেই তোমার পতাকা পুঁতে দাওনা কেন । কাজেই এইসব মানুষকে কখনও নিচু চোখে দেখবে না । আর মনে রাখবে যে নিচুতলার কর্মী বলে কিছু হয়না । সবাই কর্মী । সবাই কাজ করে । তোমার কাছে যত গুরুত্বহীনই হোক্ না কেন সমাজের বুকে সবার কাজই একটা পদচিহ্ন রেখে যায় । যেকোনো একটা কর্মীর দলকে তুমি অস্বীকার করতে পারো ? ভাবতো চাষী , শ্রমিক , পোস্টম্যান, গোয়ালা, চিকিৎসক, শিক্ষক যে কোনো একটি শ্রেণী যদি না থাকে তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে ? কাজেই কাউকে হেয় করবে না ।

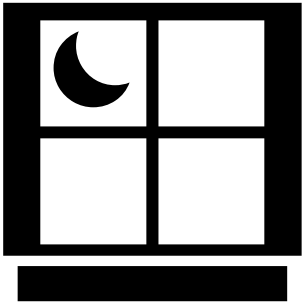

আদমের দুই চোখে স্বপ্ন । সে অনেক বড় জ্ঞানী হতে ইচ্ছুক । যদিও কাজ করে এক হার্ডওয়্যারের দোকানে বিক্রেতা হিসেবে । লোহা, তামা, ভারী ভারী মেশিন নিয়ে কাজ । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক ইউনিতে পড়ে । সান্ধ্য ক্লাস । ওর বিষয় হিউমান রাইটস্ । পরবর্ত্তী জীবনে, সেই বিষয়ে কাজ নিতে আগ্রহী ।

ও বলে :: চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম্ । সেরকম হিউমান রাইটস্ শুড্ বিগিন অ্যাট হোম্ । আমার দাদাকে যে, বাসায় থাকতে দেয়নি ওরা তার হয়ে আমি লড়বো । ও একটা বাতিল পেট্রল পাম্পে বাস করে । ভাঙাচোরা ঘরখানি আর টয়লেট । ও একাই থাকে সেখানে । খাবার খায় দূরের একটি দোকানে । নিজের একটি মোটরবাইক আছে, তা চালিয়ে চালিয়ে সব জায়গায় যায় । রোজগার করেনা তবুও বংশের মর্যাদা রাখতে মা ওকে একটা হাত খরচ দেয় । সেই দিয়ে চালায় । সরকারের কাছ থেকে ভাতার ব্যবস্থা করতে চায় কিন্তু এখনও সেরকম কিছু সুবিধে হয়নি । হলে নাকি মায়ের টাকা ও নেবে না । আসলে ওর হাঁপানির

টান আছে তাই বেশি পরিশ্রম করতে পারেনা । বুক ভরে নি:শ্বাসই নিতে পারেনা । আমি মাকে বলবো যে নিজের অসুস্থ সন্তানকে ফেলে দিলে ? এখানে এত আদিবাসীরা আশ্রয় পেয়েছে । আর নিজের ছেলে যে বুক ভরে নি:শ্বাস নিতে অক্ষম তাকে ছুঁড়ে ফেলে কোন মহাযজ্ঞ করতে চলেছো ? তুমি তো শিশাকেও নিজের কোলে তুলে নিয়েছো !

আসলে ওর মায়ের ইচ্ছে যে তার সন্তানেরা সবাই নিজ পায়ে দাঁড়াক । কিন্তু বড়দার সেই দিকে আগ্রহ নেই । কোনো কাজে মন নেই । হাঁপানি তো আর সবসময় হয়না ! আর বসে বসে সুস্থ অবস্থায় অফিস ওয়ার্কস্-ও করতে পারে । কিন্তু তাও করে না । তাই মায়ের এরকম রাগ হয়েছে । তবুও নিজের ভাই একটা পরিত্যক্ত গ্যাস স্টেশানে বসবাস করে মনে করে ভীষণ কষ্ট হয় আদমের । দাদাকে বলেছিলো আদমের সাথে এসে থাকতে । কিন্তু দাদা নারাজ । বললো যে আজ বাদে কাল তোর গার্লফ্রেন্ড হবে আর আমাকে তখন তুই তাড়িয়ে দিবি । তার চেয়ে এই ভালো । আমি সুয়োরাণীর, দুয়ো ছেলে ।

দাদাকে বড় ভালোবাসে আদম । দাদা এমনিতে খুব ওয়েল ম্যানার্ড্ আর নরম মনের মানুষ । আগে কত সুস্বাদু খাবার নিজের ভাগ থেকে আদমকে দিয়ে দিতো

। ওর অসুখ হলে দাদা গায়ে, হাতে,পায়ে মালিশ করে দিতো । ও একবার বমি করে ফেলেছিলো একটা ট্রিপে গিয়ে । পারিবারিক ট্রিপ । তখন পুরো গাড়ি সাফ্ করে দেয় ওর বড়দা, কিথ্ । তাই কিথের জন্য ওর ভারি মন:কষ্ট । কিন্তু উপায় নেই । কিথ্ একজন অ্যাডাল্ট । সে নিজে না চাইলে -আদম কিছু করতে পারবে না ওর হয়ে । ওকে আদম জিজ্ঞেস করেছিলো যে সরকারও যদি পরে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয় তখন কী হবে ?

কিথ্ মুখে করুণ হাসি এনে বলে ওঠে :: আমি তখন সুইসাইড করবো ।

আদমেরা ওদের পৃথুলা মাকে **ফ্যান্টি** বলে ডাকে , আড়ালে । **ফ্যাটের ফ্যা আর এলিফ্যান্ট এর ন্ট ; দুইয়ে মিলে ফ্যান্টি ।** তাই কিথ্কে একটু রেগে গিয়ে বলে ওঠে :: তুমি আত্মহত্যা করবে কেন হে ?

ঐ বুড়ি ফ্যান্টিকে আমি পটাবো । যাতে তুমি খোরপোষের একটা মোটা টাকা পেতে সক্ষম হও ।

ফ্যান্টি আমাদের দিতে বাধ্য কারণ ভবিষ্যৎ মালিক আমরাই । ফ্যান্টিকে দিতেই হবে ।

শুনে কিথ্ আর কিছু বলেনা । কারণ সে জানে যে মা অর্থাৎ ফ্যান্টি এরকম একেবারেই করবেন না । উনি একবার যা সিদ্ধান্ত নেন তা থেকে একটুও নড়াচড়া করেন না । কাজেই যা সে পাচ্ছে তার উপরি কিছুই হবেনা । মা ;তার জীবন সুস্থভাবে চালানোর মতন অর্থ দিচ্ছেন । সুখের জীবনের জন্য নয় । তার জন্য মায়ের কথামতন ওকে নিয়মিত কাজ করতে হবে । যা সে কখনোই করতে রাজি নয় । প্রায় রোজই তার হাঁপানি ধরে , সকালে বিশেষ করে । পাফ্ই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে । লাং ফাংশান টেস্ট সবসময়ই কম ভালো । তাই দৈহিক ও মানসিক দুই দিক থেকেই সে কেমন যেন অসাড় হয়ে পড়েছে । নিয়মিত কোনো কাজে ঢোকা প্রায় অসম্ভব । কিন্তু দু:খ হল এই যে তার গর্ভধারিনী মা এটা স্বীকার করেন না আর বোঝেনও না । **সেটাই সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা দেয় কিথ্কে । নিজের মা বলে কথা ! তাই কষ্ট হয় ।**

আজও । ছোটবেলায় মায়ের কোলেই তো শুয়ে থেকেছে । যখন নি:শ্বাস নিতে পারতো না তখন মা আর বাবা দুজনেই ওর ঘরে এসে বসে থাকতো । কারণ শ্বাস-প্রশ্বাস না চললে আর কিছুই ভালোলাগে

না । আর এখন যেহেতু ও বড় হয়ে গেছে আর পাফ্ আছে, তাই ও এখন একেবারে সুস্থ হয়ে গেছে । সেরকম তো হয়না । **পারলে এখনও রোজ একবার করে ওকে স্লিপের জন্য স্লিপ ক্লিনিকে যেতে হতো । এতই বিষ ; ওর সবুজ বাতাসে ।**

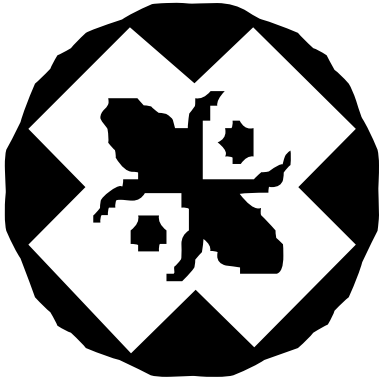

আদমের দুই চোখে স্বপ্ন- মানুষের জন্য লড়াই করার ।

সে বলেছে ; ইদানিং যে বিদেশে- সমকামীদের বিয়ে করার কথা শুরু হয়েছে তাতে সরকার সবার ভোট নিয়েছে । কিন্তু অন্যের ভোটে কেন স্থির করা হবে একটি কমিউনিটি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবে কিনা ?

ওদের কি অধিকার থাকবে না প্রেমিক ও প্রেমিকাকে বিয়ে করে একটা স্বীকৃতি দেবার ? মধুর লগ্নে ডোবার?

অন্য কেউ কেন আমার জীবনে খবরদারি করবে ? আমি যা করছি তাতে সমাজের অকল্যাণ হচ্ছে কিনা সেটা দেখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । আর ওরা তো আমরা না চাইলেও একসাথে থাকে । লিভ্ ইন রিলেশানে । কৈ তাতে তো কিছু সমস্যা হচ্ছে না ! তাহলে বিয়ে করলে সমস্যা কোথায় ?

সরকার পক্ষ ভোটের ব্যবস্থা করে । একটি কমিউনিটি নাকি এর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে । সবাইকে বলে

ওদের ইয়েস্ ভোট না দিতে । আবার পরে মিডিয়া দেখে যে অনেক ইয়েস্ ভোটের কাগজ ফেলে দেওয়া হয়েছে, ময়লার বিনে । একটা বিশেষ আলো দিয়ে নাকি দেখা যায় ব্যালট পেপার । খামের ভেতরে থাকলেও । সেটা ব্যবহার করে **হ্যাঁ -- ভোটগুলো** বেছে ফেলে দেওয়া হয় । সরকার নিরুপায় এই ব্যাপারে । জনগণের ভোট গোনা হবে । **পাবলিক সুস্থ্ হলে, কী করবে ?**

আবার সংখ্যায় এরা এত বেড়ে গেছে বা যাচ্ছে যে বেশিদিন এদের আটকে রাখা যাবেনা । কাজেই স্রোতের বিপরীতে গিয়েও বেশি লাভ হবেনা ।

আমাদের অ্যাক্সেপ্ট্ করতেই হবে ওদেরকে । সুস্থ সমাধানে গিয়ে । এগুলো ওদের বেসিক্ রাইটস্ ।

সবাইকে ফ্রি-চয়েস্ দিতে হবে । সেটাই গণতন্ত্র । আমার ইচ্ছে দিয়ে কিছু হবেনা । এইভাবে যদি ধ্বংস আসে, তাহলে আসবে । মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই । আমরা আটকাতে পেরেছি কি, নিউক্লিয়ার ওয়েপনের ছড়াছড়ি ? এইসব নিয়েই বেঁচে আছি । জীবন যন্ত্রণা মনে হলেও । কিন্তু তবুও মরালি আমরা ওদের আটকাতে পারিনি । **ওরা বলবে :: তোমরা যখন করেছো কিছু না ; আমরা করলেই দোষ ?**

ক্লাউন ফিশ্ বলে একটি মাছ আছে যারা ইচ্ছে মতন সেক্স বদলাতে পারে । ওদের দলের মাথায় বসে একজন মেয়ে । সে মারা গেলেই অন্য পুরুষ মাছ, নিজেকে বদলে **মেয়ে করে নেয়** আর দল পরিচালনা আরম্ভ করে । **তাহলে প্রকৃতিও তো সেক্স বদলানো সহ্য করছে । তাই না ?**

আবার আজকের দুনিয়ায় ; কোনো শিশু, মাতৃ-জঠর থেকে বেরিয়েই এক পেদোফাইলের খপ্পড়ে পড়বে কিনা তা কে জানে ? হয়ত ওকে যেই পাদ্রী ধর্মে যুক্ত করবে সে-ই মলেস্ট করা শুরু করলো অথবা তারও আগে হাসপাতালে কোনো চিকিৎসক, নার্স বা নিছকই কোনো ভিজিটার ! কেউ বলতে পারে এসব ?

দুনিয়া বদলে যায় । তাই একসময় ধ্বংস অনিবার্য -- আমাদের ভালো না লাগলেও ।

আদমের নিজেরই এইসব থিওরি, সে নিজেই আওড়ায় ।

ইদানিং নাকি কাগজে দেখেছে ওরা সবাই- যে এক মানব বোমা ধরা পড়েছে এক বিমান বন্দরে । সে ভেতরে যায়নি । কিন্তু এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলো যে বোমা ফাটলে অনেক মানুষ ও বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হতো । **সেই এলাকা, বিমান বন্দরের বাইরে , আইনতঃ ।**

দূর্বুদ্ধির মতন বুদ্ধির এদের অভাব নেই । আইনের ফাঁক বার করতে এদের কাছে শিখতে হয় ।

আর সেই বোমা-বাজের কাছে একটি ইউ-এস-বি পাওয়া গেছে যাতে নানা গোপন তথ্য লিপিবদ্ধ আছে । বোমাবাজের সারাদেহ বোমায় ঢাকা । তার মুখ দেখা যাচ্ছেনা, প্রায় । নিথর হয়ে ছিলো বিমান বন্দরের কাছে ।

পরে তাকে যখন আইডেন্টিফাই করা হয় তখন নাকি জানা যায় যে সে আর কেউ নয়, আদমের বড়দা-কিথ্ ।

সুস্থ, সাবলীল জীবনে অভ্যস্থ কিথ্- নাকি দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে এই পথ বেছে নেয় । সরকার ওর আপিল খারিজ করে । তাই নিয়মিত টাকা সে দাবী করলেও পেতে অক্ষম । মায়ের কাছে, দিনের পরদিন অপমানিত হয়ে হাত পাততেও সে রাজি নয় । সবচেয়ে বড় ছেলে অথচ সবাই তাকে অপমান করছে । একমাত্র আদম ছাড়া । কিন্তু তার আবদার মেনে, তার ঘাড়ে গিয়ে জুটলেও একদিন নিজের সংসার হলে কিথ্কে সে বার করে দেবে । আজন্ম হাঁপানি রোগ নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষটি, শীতকালে প্রায় জমে যায় । তবুও তার স্নেহময়ী জননী তাকে কোলে তুলে নেয়না । একটা পরিত্যক্ত পেট্রল পাম্পে সে ধূলোর মধ্যে পড়ে থাকে । এলার্জি এমনিই বেড়ে যায় । সবসময়

ফুসফুসে চাপ । দম বন্ধ হয়ে যায় । তবুও সে একা থাকে এই ভাঙাচোরা বাসায় । খাবারের সন্ধানে না গেলে তাও জোটেনা । অনেক ভেবে চিন্তেই এই লাইনে গেছে । অন্তত: কিছু মন্দলোক তাকে সম্মান দেবে মৃত্যুর পর , তাদের লক্ষ্যভেদের জন্য। উগ্রবাদীদের অর্জুন হবে সে । বৃহনল্লা আর হতে ভালোলাগছে না!

তার এক পাকিস্তানি বন্ধু যাকে স্ল্যাং-এ লোকে পাকি বলে সে ওকে মহাভারত পড়িয়েছে । ইন্ডিয়ার বই । গল্পগুলো দূর্দান্ত । আর তাকে মানববোমা করলে কাউকে টাকা দেবার ব্যাপার নেই । কারণ কিথের তো কেউ নেই ।

এক গার্ল ছিলো । **সি ওয়াজ মাই গার্ল** । সোনালি চুলের জীনা । কিন্তু সেও হাঁপের টানে নিয়মিত শ্লেষ্মা বমি হওয়া আর কিথের বেকারত্বের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে । অবশ্যি জীনার একটা ছেলে হয়েছে । কিন্তু সে জানায়নি কিথ্‌কে যে শিশুটির বাবা কিথ্‌ কিনা । কিথ্‌ও জানতে চায়নি । জীবন ওকে অনেক কষ্ট দিয়েছে । ধনীর প্রথম সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সে আজ পথে পথে । নিজ সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করেই বা হবে কি ?

জীনা নাকি এক কমন ফ্রেন্ডকে বলেওছে যে জেনে কী হবে ? ওকে খাওয়াতে পারবে অপোগন্ড, অসুস্থ কিথ্?

জীনা খুব রুড্ । মনে হয়েছে ওর বান্ধবীর । কিন্তু কি করবে, এই বাস্তব সমস্যার কোনো সমাধান জানা নেই ওর । কিথ্ খাটতে অক্ষম । একটু কাজ করলেই হাঁফ ধরে যায় ।আর ওর পরিবারে ও অচ্ছ্যুত । পচা ডিম, ঈষৎ রটেন বেকন্ , পুরনো সস্ দিয়ে ওকে খাবার দেয় ও যখন বাড়ি যায় । বলে লোকে :: কেউ খাবেনা তবুও রেখে দাও , কিথ্ এখানে এলে খাবেখন!

ওকে কেউ চায়না । কাজেই বাচ্চাটি কার জেনে হয়ত ওর বিপদ্ই বাড়বে । বিশেষ করে জীনা যদি ওর কাছ থেকে অর্থ দাবী করে বসে , ভরণ পোষণের জন্য ।

বান্ধবী, আর বেশি ঘাটায় না জীনাকে । কিথের জীবনের এই রহস্য-- সমাধান করার আর কোনো চেষ্টাই করেনি বান্ধবী মেরী । মেরীর অবশ্য ব্যাক্তিগতভাবে কিথের প্রতি একটু সহানুভূতি আছে । অসুস্থ মানুষ একটি যাকে তার নিজের লোকেরাই ত্যাগ করেছে । খামোখা তাকে কষ্ট দিয়ে আর নিজেকে ছোট করতে চায়না মেরী । তাই বুঝি বলে ওকে :: এসব ভুলে যাও । আমাদের সমাজে, এরকম কজনের বাবা তোমরা ছেলেরা তার সঠিক হিসেব কি কেউ

রেখেছে ? কাজেই গুহার দরজা বন্ধই থাক্ । ওকে খোলার ম্যান্ট্রা (মন্ত্র) না খুঁজে নিজের কথা ভাবো । কি করে নিজেকে সুস্থ রাখা যায় ।

বোমার আঘাতে কিছু নিরীহ মানুষকে শেষ করে নিজেকেও শেষ করে দিতে চায় কিথ্ । তখন দেখবে তার বাড়ির লোকের কী অবস্থা হয় । যাদের এত সম্পদ, তারা একটি অসুস্থ মানুষকে ত্যাগ করে আর সে গৃহহীন হয়ে যায় । কেউ তাকে বাড়িতে ডেকে আনেনা । এবার যখন বিশ্ব-সংসার জানবে এই বোমাবাজের করুণ কাহিনী তখন তারা কী করে কিথ্ স্বর্গ নয় নরক থেকেই দেখবে ।

কিথের এই পরিণতিতে সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছে আদম । কিন্তু আদরের বড়দা, না নিয়েছে কোনো উকিল না সরকারের কাছে কোনো আবেদন করেছে । সে মরতেই চায় । বোমায় নাহলেও ফাঁসিতে । আর যে স্থির করেই ফেলেছে যে সে মরবে ; তাকে বাঁচানোর সাধ্য হয়ত ভগবানেরও নেই ।

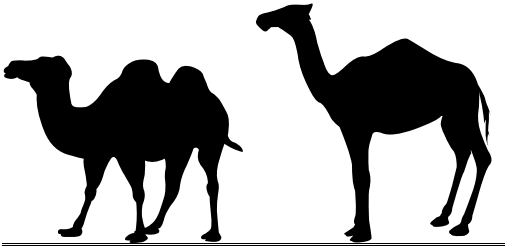

আদমের কাছেই জেনেছে লিয়া যে অনেক উন্নতদেশে Incest -লিগ্যাল ; Incest is a 'fundamental right', রক্তের সম্পর্ক কিংবা সৎ ভাইবোন, মা , বাবার সাথে বিয়ে করা চলে ।
এগুলো কোনো ট্যাবু নয় ।

আদমের জীবনে ছিলো ওর বড়দা আর হিউমান রাইটস্ । বড়দা জেলে । আর ও, একজন আইনি পরামর্শদাতা এখনো হয়ে ওঠেনি বটে তবে মানুষের বেসিক রাইটস্ নিয়ে সবসময় চিন্তিত । সবার নানারকমের অধিকার থাকা উচিৎ । বিভিন্ন রাইটস্ । এইরকম আরকি ।

লিয়াকে ও নানান পরামর্শ দিতো আর লিয়াও শুনতো । একবার বললো :: তুই এক কাজ কর না কেন , তোর মায়ের সাথে দেখা কর । এটা তোর রাইট্ । রাইট্ টু ফাইন্ড ইওর মাম্মি ।

খানিকটা আদমের মগজ ধোলাইতেই আচ্ছন্ন হয়ে লিয়া ওর মায়ের সন্ধানে যায় । খবর নিয়ে জানতে পারে যে ওর বাবা আর জীবিত নেই । বায়োলজিক্যাল ফাদার ।

সরকারের কাছে সমস্ত নথিবদ্ধ আছে । কিন্তু মা বেঁচে আছে । তার বর্তমান ঠিকানা বদলে গেছে বলে কিছুদিন সময় লাগবে তাকে খুঁজে পেতে ।

তারপরই ও আদমকে সাথে নিয়ে যাবে নিজের অধিকার ফলাতে, মানে অধিকার অনুসারে শিকড়ের খোঁজে আর জন্মদাত্রীর সাথে সম্ভব হলে একটা সেল্ফি নিতে । অবশ্যই যদি মারধোর না খায় আদিবাসীদের কাছে ।শুনেছে ওরা অসভ্য আর বুনো । ভদ্রতার বালাই নেই কোনো । দেখা যাক্ , লিয়ার ভাগ্যে এবার কী আছে । এক তো ছিলো অন্যের কাছে মানুষ হওয়া । তবে আদম বলে যে :: দু:খ করিস্ না । দেখনা , আমার দাদা তো নিজের মায়ের কাছেই বড় হয়েছে কিন্তু তার ফলাফল কী হল ? আজ সে সমাজের বুকে এক অপরাধী- যে ধনীর দুলাল হওয়া সত্ত্বেও অভাবের তাড়নায় মানব বোমা হয়েছে । এটা কি কম দু:খের ? তাই এসব নিয়ে ভাবিস্ না । কী হতে পারতো বা কী হলে সব ভালো হতো, মনোমতন হতো না ভেবে বরং

ভাব কী করলে এখন সব ভালো হবে । বেশিরভাগ মানুষের দেখবি মনোমতন সব হয়না । তবুও আমাদের বেঁচে থাকতে হয় । তুইও বাঁচতে শেখ । জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচা যায়না । জীবনকে উপভোগ করতে শুরু করে, দোষারোপ না করে- দেখবি সব মধুময় হয়ে

উঠেছে । জন্ম , চেহারা , কূলশীল তো তোর হাতে নয় কিন্তু তোর **ফ্রি উইল** আছে । সেটাকে ভালোমতন ব্যবহার করতে শেখ ; কে কী করেছে না করেছে তার জন্য তুই নিজের জীবনকে নষ্ট করবি কেন ? ওসব ভুলে যা ।মাকে দেখে আয় । তবু তো তোর মা । নিজ গর্ভ থেকে তোকে জন্ম দিয়েছে । ভূমিষ্ঠ নাহলে কী আর এত প্রশ্ন করতে পারতিস্ ? নাকি এই সুন্দর জগৎ দেখতে পেতিস্ ? সবসময় মনে রাখবি যে তোর চেয়ে দু:খেও আরেকজন আছে । কোথাও । তুই জগতের শেষ দুখী নোস্ ।

আদম খুব সুন্দর কথা বলে । অনেক কিছু চিন্তা করতে পারে তাই লিয়ার ওকে ভালোলাগে । ওর সাথে গভীর বন্ধুত্ব আছে । কলেজের পরেও যোগাযোগ আছে । একবার ওদের বাসায় গিয়েছিলো যীশু দিবসে ।

ওরা সবাই ওকে নিয়ে মজা করছিলো । বলছিলো যে তোমার বাবা-মা কি রাজপরিবারের লোক ? এখানে যত এশিয়ান আসে সবাই দাবী করে যে দেশে তারা রয়াল ফ্যামিলি । সবার রাজত্ব জুড়লে হয়ত জুপিটারের চেয়েও বড় হয়ে যাবে । তা এই এক্সট্রা জমি কোথায় রাখো ? নাকি কোনো চিপে লুকিয়ে ফেলো । কেউ যাতে না দেখে ! বলেই সবাই খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে !

সেখানেই লিয়া, খিলখিলিয়ে ওঠা উন্মাদিনীকে দেখেছে । **হানি বি ভেনমের** কারণে যার দেহ অসুস্থ হয়েছে আর তাই বাউল হয়েছে তার মনও ।

গায়ে জ্বালা ধরা এক হাসি দেয় সেই মহিলা ।

নাম তার শিশা । হাসির শব্দে যেন আশেপাশের সব কাঁচ ভেঙে পড়ে । ঝনঝন্ করে ।

--হিহিহিহিহিহি !!!

মনে হয় কষে এক থাপ্পড় মারি । এমন আওয়াজে হাসে । কিন্তু মাথার ঠিক নেই তাই কিছু বলাও যায়না । সহ্য করা ব্যাতীত আর কোনো উপায় নেই ।ওর সামনে থাকলে মনে হয়, জগৎ সংসারের সমস্ত অন্যায় আর অপরাধের জন্য শ্রোতাই দায়ী !

আর ওর চোখ দুটো থেকে ঠিক্‌রে বার হয় ঘৃণা আর রাগের রশ্মি । কেমন যেন গাঢ় নীল আর ঘন কমলা সেইসব আলোক রশ্মি । অবাক লাগে শিশাকে দেখে । ওকে পাগলের চেয়েও বেশি এক বিদ্রোহী মনে হয় । কিন্তু ওর কার ওপরে রাগ ? ওরা বনজ মানুষেরা তো এইসব হানি-বি ভেনমে অভ্যস্থ । তাহলে ও কাকে দোষী ভাবে ? নাকি কেউ ইচ্ছে করে ওকে বিষ দিয়েছে ? জানা সম্ভব নয় আর জানতে চাওয়া উচিৎও নয়, লিয়ার । আদম বলে যে সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার

দরকার নেই । **কিছু কিছু অংক, মিলেনিয়াম প্রবলেমের মতনই আন্‌সলভড্‌ থাকুক । তাতেই জীবজগতের মঙ্গল ; সেইসব সময়ে ।**

আর এ তো আদমের খামারবাড়ির মানুষ । ওখানেই থাকে , হাসে আর ঘুরে বেড়ায় । স্বয়ং দায়িত্ব নিয়েছেন আদমের মা- জননী । কাজেই লিয়ার কী যায় আসে ?

সে কি পারবে দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান করতে ?

কাজেই আপাততঃ নিজের জন্ম-রহস্য নিয়েই ব্যস্ত আছে ।

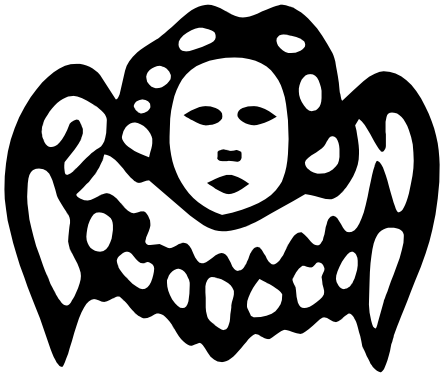

লিয়া যথাসময়ে ওর জন্মদাত্রী মা , বিন্দির কাছে এসে পৌঁছায় । বিন্দি তো আজকাল মেমসাহেব । সে কোনো নেটিভ নারী নয় । কেতাদস্তুর পোশাকে চেনা দায় ।

মুখের ভাষাও বিদেশীদের মতন । যেই এলাকায় বিন্দি এখন থাকে, সেখানে খুব ঠান্ডা । সরাসরি বরফ না পড়লেও কনকনে শীত পড়ে । হাড় হিম হয়ে যায় ।

একটি পুরনো একতলা কাঠের বাড়িতে থাকে বিন্দি মেমসাহেব । সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাড়ি । উঁচু ছাদ । আর বিরাট ফায়ার প্লেস । সেখানে কাঠ সংযোজন করতে করতে বিন্দি হেসে বলে ওঠে :: আর তিন মাস আগে এলেও আমি বিশ্বাস করতাম না যে তুমি আমার মেয়ে । সেই হারানো মেয়ে । কিন্তু এখন সব অন্যরকম ।

চা খাবে ? তোমাকে আমি এলাচ দেওয়া চা তৈরি করে দিতে পারি । মা ও মেয়ের প্রথম সাক্ষাৎ- কী বলো ?

লিয়া স্বচ্ছন্দ হতে সময় নেয় । মা বলে কথা ! মা কেমন হয় সে তো আর জানেনা ! কাজেই সময় তো লাগবেই । লিয়া হ্যাঁ বলে ছোট্ট করে । তারপর মায়ের ঘরের

নানান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাঁখ , পাথর ও পাখির পালকে হাত বোলাতে থাকে । মা বলে যে এসবই ওর প্রথম প্রেম ওকে দিয়েছে । তার নাম ছিলো লখিম । লখিম একজন গুহা বিশারদ । কৈশোর থেকেই সে নানান গুহায় ঘুরে ঘুরে তাদের সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছিলো । ওদের উপজাতিদের মধ্যে, গুহা সংস্কৃতি বিশেষ একটা স্থান নিয়ে আছে । ওখানে আছে ওদের নানান প্রজন্মের আঁকা চিত্র, মূর্তি , বিভিন্ন কলার হদিস্ । ওদের মধ্যে যারা প্রিস্ট , তারা ঐসব গুহায় গিয়ে, বিশেষ শিকড় বাকরের সাহায্যে নিজেদের তৃতীয় নয়ন খুলে ফেলে, পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের সাথে যোগাযোগ করতো । তারাই ওদের ভবিষ্যতের পথ দেখাতো । আর ঐসব গুহা হল কঙ্কাল সংরক্ষণ করার জায়গা । ওদের মধ্যে যারা বিশেষ গুণ ও জ্ঞানের অধিকারী তাদের কঙ্কাল ওখানে রাখা হত । অনেককে সমাধিস্থও করা হতো । তাই গুহার সাথে উপজাতি কালচারের একটা স্পেশাল যোগ আছে । ওর প্রেমিক লখিম ; এসব গুহার সমস্ত কিছু জানতো । প্রতিটি অংশের কথাকলি তার নখদর্পণে । তাই সে ওদের সমাজে বিশেষ আদৃত । কিন্তু বিন্দির বাবা ওকে পছন্দ করতো না । তার ইচ্ছে ছিলো কোনো বীরপুরুষের সাথে মেয়ের বিয়ে হোক্ । কারণ ওর বাবা ছিলো ওদের দলের সর্দার । আর খুব বীর একজন মানুষ ।

তাই মেয়ের বর হিসেবেও, সেরকম বীর একজনকে কামনা করে ; তাই লখিমের মতন জ্ঞানী ও ঈষৎ মগজের কারবারি একজনকে- বাবার যথারীতি মনে ধরেনি ।

বিয়ে হলনা তাই । মনের দু:খ চেপে বিয়ে করতে হল বাবার পছন্দের পাত্র নিম্বিয়াকে । যেই নিম্বিয়া আজ আর জীবিত নেই । বীরপুরুষ হলেও, আধুনিক অস্ত্রসজ্জার সামনে সে হেরে যায় । বিষাক্ত তীরের ফলা নির্জীব হয়ে যায় গুলির কারণে । মিশালদের হাতি, ঘোড়ায় করে যুদ্ধ- একদম দূর্বলের রণকৌশল হয়ে যায়, অত্যাধুনিক মোটরে চেপে- গোলাবারুদ নিয়ে যুদ্ধের সাথে । অভিমন্যু হয়ে শৃঙ্খলিত হল নিম্বিয়া । আর সাথে সাথে পরাজিত হয় মিশাল গোষ্ঠী । রাজত্ব শুরু হয় সাদাদের । কারণ প্রতিবাদ করার আর কেউ নেই । যুদ্ধ যত ক্ষুদ্রই হোক্ তা একপক্ষের যেমন আনে ধ্বংস সেরকম কোথাও কোথাও কোনো না কোনো রাজপুতানি রমণী , দিয়া জ্বালিয়ে বীরকে রাজতিলক পরায় আর হোলির আয়োজন করে অমৃত কোনো বসন্তে ।

নিম্বিয়া মারা যাবার পরে বিন্দির সাথে দেখা করে যায় তার চিরসখা লখিম। ছোট থেকেই একসাথে বড়

হয়েছে তো ! মাঠে ঘাটে ঘুরে , ফলমূল পেড়ে , ফুল তুলে- বনফুলে সাজিয়েছে একে অপরকে ।

বন্ধুত্ব থেকেই গাঢ় প্রেম । ভালোবাসা । কিন্তু সব প্রেম বিয়েতে পৌঁছায় না । সারাটা জীবন নিস্কাম ভালোবাসা আর পরজন্মে আবার কাছে পাবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা । গুহা বিশারদ লখিম কিন্তু সাদাদের সাথে লড়াইতে যায়নি । বদলে ওদের হয়ে কাজ করেছে । ওদের মধ্যে একজাতের মানুষ আছে যাদের বলে প্রত্ন বিদ্ । তারাই লখিমকে নিয়ে অনেক কাজ করেছে । মিশাল উপজাতির ইতিহাস সম্পর্কে সাদারা বিস্তারিত জেনেছে , পুঁথি লিখেছে আর আরো গবেষণা করেছে ।

ইদানিং অনেক সাদা মানুষ, এই মিশাল সংস্কৃতি নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করছে । আর তাদেরই রক্ষাকর্তা ও পথ প্রদর্শক হল বিন্দি মেমসাহেবের প্রথম প্রেম, লখিম ।

পুরো নাম লখিম নাড়ু । আমাদের তামিল নাড়ুর মতন । ওকে দেখতেও দ্রাবিড়দের মতনই । গড়পরতা কালো মানুষ । সীসার মতন দেহ আর চিতার মতন ক্ষিপ্রতা যদিও করে মগজের কাজ । আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি ওর !

যাকে বলে ফটোগ্রাফিক মেমারি । কোনো জিনিস একবার দেখলে ভোলেনা । ওদের শিলালিপি যেগুলি আমাদের কাছে চিত্র তা আদতে একজাতের লেখার

বর্ণও বটে । সেগুলো একবার দেখে নিলে আর সহজে ভোলেনা লখিম নাড়ু । লখিম কিন্তু আর বিয়ে করেনি । বিন্দির বিয়ের পরে সে ডুবে গেছে গুহার ইতিহাসে । সাদাদের সাথে তাঁবু ফেলে ফেলে, নানান গুহায় গিয়ে গিয়ে ; নিজেদের সংস্কৃতির সাথে সাহেবেদের পরিচয় করিয়েছে । মুখে সবসময় হাসি এই সরল মানুষটির । কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই । কোনো দু:খের লেশমাত্র নেই যদিও জীবন তাকে সবকিছু দেয়নি যা চেয়েছিলো- আর কোনো বিষাক্ত ভাবনাও নেই । সবার ভালো হোক্, সবকিছু ভালো থাকুক এই তার জীবন দর্শন । হয়ত লখিম ওর লাভা নি:সরণ হবার পথটা চেপে রেখেছে । কে জানে !

ও নাকি সত্যিকারের আগ্নেয়গিরি দেখেছে । আর সেটা সত্যি । অনেকেই দেখেছে । কীভাবে একটি মৃত পাহাড় থেকে হঠাৎ লাভা স্রোত বেরিয়ে আসে- রাতে ।

আকাশ ঢেকে গেছে কালো ধোঁয়ায় । আগুনের তাপ ও স্রোতে বিহ্বল ধরিত্রী ! সেইসময় ঠিক সেইসময় সেখানে উপস্থিত ছিলো লখিম । অদ্ভুত ভালো লোক লখিম নাড়ু । তবে এই ঘটনায় ওর একটি পায়ে একটু জখম হয় ,তাই অল্প খুঁড়িয়ে চলতো ।আর পরে বিয়ে না করাতে সাদাদের অনেকেই বলতো যে ও যেমন খুঁড়িয়ে হাঁটছে , ওর জীবনটাও সেরকম খুঁড়িয়ে চলেছে তাই

এই জীবনে অশেষ জ্ঞানী হলেও, দৈহিক চাহিদা মিটলো না । লখিমের কানে গেছে এগুলো , গেছে বিন্দিরও কানে । লখিম কোনো আবেগ প্রকাশ করেনি তাতে- আর বিন্দি লুকিয়ে কেঁদেছে । কারণ তার জন্যেই লখিম বিয়ে করেনি । নাহলে মিশাল গোষ্ঠীতে, এমন সুপাত্রের জন্য কী আর মেয়ের অভাব হয় ?

লখিমকে, যখন কৈশোরে লোকে **বিন্দির বর** বলে ক্ষ্যাপাতো তখন **বিন্দির** বাবা অসম্ভব ক্ষেপে যেতো । বলতো , আমার মেয়ে এরকম এক নীলা, পচা রক্তের, প্যাংলা , মাথাপাগল ছেলে, যে তীরধনুক চালাতে জানেনা আর সবসময় গুহায় গিয়ে পড়ে থাকে তাকে বিয়ে করবে না । আমার মেয়ে সর্দারের মেয়ে সে কোনো উজবুককে বরমাল্য দিতেই পারে না ।

হলও তাই । নিম্বিয়া ছিলো অসীম সাহসী আর বড় যোদ্ধা । তবে তার গলায় বনফুলের মালাখানি পরালেও ভালোবাসতে পেরেছিলো কী কোনোদিন বিন্দি ?

লিয়া জানতে পারলো যে লিয়ার জন্যেই (বিন্দিরা ওকে তাতুম বলে ডাকতো) বিন্দি, এক সাহেব- থিওডোরের সাথে সহবাস শুরু করে । থিওডোর, সরকারের দপ্তরে কাজ করতো -যেই বিভাগ এইসব মিশাল উপজাতিদের নিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে ।

কাজেই মেয়েকে ফিরিয়ে দেবে বলেই সে বিন্দির কাছে আসে প্রথমদিকে । ভরসা পেয়ে বিন্দি ওকে সব দেয় । নিম্বিয়া অবশ্যই ততদিনে মৃত । জীবিত থাকলে হয়ত এমন হতো না ।

থিওডোর, বিন্দির রান্না খেয়ে খুব প্রশংসা করতো । মিশাল উপজাতিই, সাদাদের মিষ্টি আলু, কচু, বুনো ওল, ভূট্টার দানা , নানান শাক আর সাপ খেতে শিখিয়েছে । এছাড়া **গুহা পন্ডিত লখিম নাড়ুর** সংস্পর্শে এসেই ওরা জানতে পেরেছে বাদুড়ের বিষ্ঠার উপকারিতা সম্পর্কে । সার , ঔষধি ইত্যাদি নানান কাজে লাগে বাদুরের ফেলে দেওয়া বস্তু ।

গুহায় থাকে যেসব বাদুড় ,তাদেরই মল হতো মিশালের ব্যবহৃত বস্তু আর তাই দিয়ে তৈরি হত এসব জিনিস ।

থিওডোর , বিন্দির নিজ হাতে রান্না খেতে ভালোবাসতো । পাউরুটি আর মাংসের বাইরেও যে খাদ্য আছে তা শেখায় ওকে বিন্দিই । তাই বিন্দির প্রথমে মনে হয়েছিলো যে সে একজন মহামানব- যে উপজাতিদের ভালোবাসে । কিন্তু পরে যা দেখলো তাতে বিন্দির কেবল চক্ষু চড়ক গাছই নয় একেবারে মর্মাহত হয়ে পড়লো ।

আসলে সেদিন বিন্দি, একেবারে মেমসাহেব সেজে গিয়েছিলো একটি laughing gas party- তে ।

সাহেবের সঙ্গিনী , সাদাদের সমস্ত কালচারেই নিজেকে রপ্ত করে ফেলেছিলো- বহুদিন একসাথে বসবাস করার কারণে । এইসব পার্টিতে, অভিজাত লোকেরা লাফিং গ্যাস ইনহেল্ করে ইউফোরিয়াতে ক্ষণকাল বসবাস করতো । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেলুন ব্যবহার করা হতো নেশার জন্য । ঐসব বস্তু সরবারহ করতো থিওডোরের এক পরিচিত । এইসব পার্টিতে যাওয়া স্টেটাসের ব্যাপার ।অভিজাত মহলের মানুষের সাথে ওঠাবসা করা যায় । অনেক আশা ও স্বপ্ন পূর্ণ হবার সুযোগ মেলে আর ধনীদের নেক্ নজরে পড়বার সম্ভবনা থাকে যা থেকে পরবর্ত্তীকালে আরো সুবিধে পাওয়া যায় ।

কাউকে কিড্ সিস্টার , গডফাদার , সোলমেট ইত্যাদি বানিয়ে ফেলতে পারলে তো কথাই নেই । এইসব ফেক্ সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই বেশ প্রফিট দেয় । অর্থ দেয় , যশ দেয় এমন কি সম্মানও দেয় ।

বিন্দি মেমসাহেব এই হাসি হাসি মুখ পার্টিতে যায় থিওর সাথেই । প্রথম । ওকে গাঢ় নীল ভেলভেটের হাত কাটা গাউন পরিয়ে নিয়ে যায় থিওডোর ।

গলায় উজ্জ্বল মুক্তো । প্রথম প্রথম বিন্দির পোশাক বেছে দিতো থিওডোরই । পরে বিন্দি শিখে নিয়েছিলো রং ও নক্‌শাকে আয়ত্বে আনা ।

পার্টিতে অবশ্যই **নেটিভ বিন্দির** সাথে লোকে মিশতো । কারণ থিওডোর কোনো ঢাক ঢাক গুড় গুড় করেনি বিন্দির মিশাল জাতির রক্ত নিয়ে । হলই বা কৃষ্ণকেশী, ভ্রমরকালো এক নারী ! নারী তো বটেই ! সাদা ফ্যাট ফ্যাটে , চর্মরোগ সমৃদ্ধ মেয়ে দেখে দেখে অথবা প্লাস্টিক সুন্দরী-- অভিজাত মহলও বিরক্ত । এই মেয়ে হল অফবিট্ মেয়ে । সাদারা ডিপ্লোম্যাসি বোঝে । অত্যন্ত কুৎসিত কাউকে লাভলি বলতে বুঝি ওরাই পারে । বিন্দি ঐসব পার্টিতে যেতে যেতে এমন অভ্যস্থ হয়ে গেলো যে পরের দিকে একাই যেতো । জীপগাড়ি নিয়ে ।

সেই পার্টিতে ইদানিং এক মহিলাকে আনা হতো । সে খালি হাসতো । গায়ে জ্বালা ধরানো অদ্ভুত এক হাসি !

আসলে লাফিং গ্যাস শুঁকে নিতে নিতে মানুষ যখন নেশায় মাতে আর খুশীতে আচ্ছন্ন হয় ঠিক তখনই যদি

ব্যাকগ্রাউন্ডে কেউ হা হা হা , হো হো হো করে হেসে ওঠে অনবরত, সেই হাসিই নেশা-ধরা মানুষকে এক ইন্দ্রিয় বহির্ভূত , মহাজাগতিক স্পর্শ দেয় । এরকমই মনে করে পার্টির আয়োজকরা । তাই সেই মহিলা নিয়মিত এইসব পার্টিতে হাজিরা দেয় ।

বিন্দি ওকে দেখেছে । নেটিভ মেয়ে । বা মহিলা । কেমন রং চং মুখে মেখে , সস্তা জরি আর বড় বড় ফুলের মালা পরে এসেছে । নাম তার শিশা ।

বিন্দির জনজাতি, একটি রং খেলায় মাতে । বছরে দুবার । নাম বাংলায় হতে পারে রং-বর্ষা । তখন ওরা সারাদেহে রং মেখে, নানান চরিত্র সাজে- আমাদের গো অ্যাজ ইউ লাইকের মতন । রং আসে ফুল, পাতা, ফল ও নানান রঙীন পাথর বেটে । শিশাও ওরকম সেজেছে ----শিশা ; শিশা ভাঙার শব্দে , সমানে হাসছে । একনাগাড়ে হেসে চলেছে । হয়ত এটাই ওর পেশা ! নেশাকে, নেশাবিদ্ধ করার পেশা !

মাঝে মাঝে, দেওয়ালে লাগানো বিশাল আয়নায় নিজেকে দেখছে আর মুখ ভ্যাঙাচ্ছে ! কখনো বা ললিপপের মতন কিছু একটা চুষছে । আর সমানে হেসে যাচ্ছে ।

--হি হি হি হি !!!!

পরে অবশ্যি বিন্দি জানতে পারে যে ঐ মহিলা আসলে পাগল । ওকে এই হাসার কাজে লাগিয়েছে ওর মালকিন । এক খামারবাড়িতে থাকে এই উন্মাদিনী । আর কোনো নেটিভ ওষুধের জন্য ওর এই অসুখ হয়েছে । হয়ত মাথার স্নায়ুতে ক্ষয় ধরে গেছে । যার কোনো চিকিৎসা নেই । আর বেকার বসে না থেকে ওকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে ওর মালকিন । বদলে খেতে পরতে দিচ্ছে । কাজ হল হেসে যাওয়া । ননস্টপ্ । আর সেটা একজন পাগলিনী হিসেবে ও এমনিই করে থাকে ।

এখানেই একদিন বিন্দির চোখ খুলে যায় । সে জানতে পারে যে তার প্রেমিক ও হিতাকাঙ্খী , থিওডোর বর্তমানে তারই চোখের আড়ালে তার কন্যা , তাতুমকে নিয়ে যৌনক্রীড়ায় মেতেছে । মেয়ে নাকি ওকে বিয়ে করবে আর সে গর্ভবতী হয়েও পড়েছে । থিওর সন্তানের মা হলনা বিন্দি নিজে, আর মেয়ে তাতুম সেই পথেই পা দিয়েছে । বিন্দি যদি মেনে না নেয় তবে ওরা নাকি ওকে ত্যাগ করবে । এইসব সম্পর্ক যেখানে স্বীকৃত, সেইসব দেশে নাকি ওরা চলে

যাবে । বিন্দি যদি মেনে নেয় ভালো, নাহলে তাকে ওরা তাড়িয়ে দেবে ।

এতদূর গড়িয়েছে ঘটনা আর বিন্দি একই বাসায় থেকেও কিছুই জানতে পারেনি । অবশ্য থিও ওদের আরেক বাসায় গিয়ে সপ্তাহের কয়েকদিন থাকে । কাজের বাহানায় । তখন বিন্দি বোঝেনি যে এগুলো থিওর নানান ছুঁতো কিন্তু এখন সব জলের মতন পরিস্কার । এবার থেকে প্রেমিককে মুখপোড়া ,ইতর বলতো ।

বিন্দি, সত্যি খুব ভেঙে পড়ে । মেয়েকে তাহলে কোনো শিক্ষায়ই দিতে পারেনি সে । তার চেয়ে সরকারের কাছে থাকলে হয়ত ভালো কিছু করতো । হয়ত নিজের সমকক্ষ এক যুবকের স্ত্রী হতো । এইভাবে মায়ের প্রেমিকের দিকে হাত বাড়াতে হতো না । নিজের রক্ত যখন কুপথে বয়ে যায়, তখন বেদনা অসহ্য হয়ে ওঠে ।

যেন নিজের সমস্ত সংস্কার ও অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছে নিজেরই রক্তকণা দিয়ে গড়া এক ক্ষুদ্র অংশ !

মানুষ তো মানুষ । পশু নয় । পশুরা সবাই সবার সাথী হয় বলে মানুষও যদি সেরকম করে তাহলে হুঁষের কী

হবে ? মান প্লাস হুঁষ ? আমরা একা থাকতে পারিনা বলেই সমাজ গড়ি । মানবিকতার বুলি আওড়াই ।

কোমল হই। দরদী হই । কোনোমতেই আমরা পাশবিক নই- এটাই প্রতিটি মানুষ দেখাবার চেষ্টা করে হয়ত । কিন্তু তাতুম আর থিওর সম্পর্ককে কি মানুষের সুস্থ সম্পর্ক বলা যায় ? বাবা-তা হলই বা পাতানো , নিজস্ব নয় ; সে তো ওর মায়ের সাথী । ওর কেবল তার কাছ থেকে পাওনা বুকভরা স্নেহ আর মুঠো মুঠো ভালোবাসা । প্রেম নয় । সেক্স নয় । রোমান্স নয় । তাহলে কী করে এই কাজ করলো ওরা দুটি পাখী ?

বিন্দির অন্তরে আজ অসম্ভব জ্বালা । এই জ্বালা হেরে যাবার অথবা কদর্য সম্পর্কের সামনাসামনি হবার যন্ত্রণা নয় ; এই জ্বালা হল নিজের অস্তিত্ব হারাবার জ্বালা । কিসের ওপরে আর দাঁড়িয়ে থাকবে সভ্য , সাদা বা কালো সমাজ ? আবেগ আর সম্পর্কই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে । গহ্বর আর চূড়ার বাইরেও সম্পর্ক না থাকলে মানব সমাজে ঘুণ ধরতে কতক্ষণ ?

বিন্দি মেমসাহেব , জন্মসুত্রে তো আর মেম নয় কাজেই সে একটু আর একটু কেন বেশ ভালোরকমই ট্রাডিশনাল । কাজেই এতটা আধুনিক ভাবধারা অথবা অত্যাধুনিকতা মেনে নিতে তার খুব কষ্ট হলো । ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলো হৃদয় । এমন ঘটনার কথা

জেনেই শুধু নয় এই ব্যাপারটির সঙ্গে তারই দুই আপনজন জড়িত । আর এটা এমন বেদনার সৃষ্টি করেছে যা অন্যের সাথে ভাগ করে নেওয়া চলেনা । আজ ওরা সবার হাসির খোরাক । পার্টিতে সবাই বলছে যে থিওডোর শিশুবয়স থেকেই তাতুমকে মলেস্ট করেছে, তাই তাতুম ওকেই স্বামী হিসেবে বরণ করতে চাইছে আর ওরই সন্তানের জন্ম দিতে চলেছে ।

নিজের মেয়ে, মানে স্ত্রীর আগের পক্ষের মেয়েকে নিজ সন্তান না মনে করে প্রেমিকা রূপে দেখেছে আর নিয়মিত ভোগ করে গেছে । কিশোরীটি জীবন কী তার সংজ্ঞা ভালো করে বোঝার আগেই প্রণয় বাণে জর্জরিত হয়ে মায়ের প্রেমিকের হাতে নিজেকে অর্পণ করেছে । পুতুল খেলাকে রিয়ল লাইফ ভেবে বসেছে । নকল আর আসলে পার্থক্য করতে না পেরে, সমস্ত আবেগ লুটিয়ে দিয়েছে থিওডোরের পায়ে আর অবশ্যি দেহে ।

তার নাকি থিওডোরকে ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে শয্যায় পেলে ভয় লাগবে ।

ভীষণ কষ্ট থেকে জন্ম নেয় হতাশা । জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা । আত্মহত্যা করতে পারেনি লখিমের জন্য । সে প্রায়ই আসে। বিন্দিকে মিষ্টি মিষ্টি কথা, উপদেশ শোনায় । বলে :: এসব হবেই । ভিন্ন সংস্কৃতির লোক ওরা । আমাদের সমস্ত কিছু লেখা ও আঁকা আছে

গুহায় গুহায় । আমরা এদের কাছে নেহাৎই অসভ্য এক জনজাতি । আর এরা হল সভ্য , এগিয়ে যাওয়া জাত । তবে এগিয়ে যাবার মানে যদি হয় এইসমস্ত স্নেহ ভালোবাসাকে দুমরে মুচড়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া, তাহলে লখিম নাকি বলবে ওরা অসভ্য হয়েই ভালো আছে । আবডাল আছে , শান্তি আছে । এদের কোনো কিছুর কোনো আড়াল নেই তাই এরা ধীরে ধীরে নিচে নামছে ।

এই লখিম যে বিন্দির জন্য বিয়ে করেনি আর ওকে সত্যিকারের ভালোবাসে-- সে নিয়মিত এসে এসে , কথা বলে বলে বিন্দির মন:কষ্ট দূর করার চেষ্টা করেছে ।

বিন্দিও বুঝেছে এইসব সম্পর্ক অসম্ভব গভীর । লখিমের মতন এক গভীর মানুষের পক্ষেই একে টেনে যাওয়া সম্ভব । সব মানুষের মনের স্কেচ্ দেখা যায়না ।তার গভীরতা আর কাঠিন্য । তাই লখিমকে নতুন আলোয় দেখছে । লখিমের গাত্রবর্ণ একদম গাঢ় নীল । আমাদের শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুরের মতন হয়ত । বেগুনী ঠোঁট, নীল বর্ণ আর চকোলেট রং এর রক্ত তার ।

ওকে লোকে নীলা বলে তাই । সীসার মতন মসৃণ আর ওর বরণ হল নীল । এটা অসুখই বটে । বিজ্ঞানীর ভাষায় Congenital Methemoglobinemia -!

তবে লখিম নাড়ু কিন্তু এখনও জীবিত আর সুস্থ । তাই ওর গায়ের রং সম্পর্কে লোকে বলে যে এটা সুস্থ ও স্বাভাবিক রং । কোনো রক্ত কিংবা অন্য কোনো অসুখে নয় । হতেই পারে , কাল্পনিক জগতে সবই হয় ।

বিন্দির কটেজ থেকে দেখা যায় দূরের পাহাড় । দিগন্ত বিস্তৃত সর্ষে ক্ষেত । কত সময় ও আর থিও একসাথে ওদের বাসার বারান্দায় বসে থাকতো, পালং আর টমেটো ক্ষেতের পাশে । সবুজাভায় নিজেদের সবুজ মন হারিয়ে ফেলতো । তারপর একদিন বিন্দির কথা ভেবে , ওর জন্যই নিয়ে এলো তাতুমকে । বিন্দি আর নিম্বিরায় মেয়েকে । সরকারের কাছ থেকে সমস্ত নথিপত্র ঘেঁটে । তৃষ্ণার্তের মুখে দিলো জল , মায়ের

বুকে তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরিয়ে দিলো । নিজে বসলো মহামানবের গালিচায় ।

তাহলে আজ সরকারি সমস্ত কাগজপত্র ও শীলমোহর নিয়ে যেই মেয়েটি এসেছে লিয়া রূপে , তাতুমের মায়ের কাছে সে তবে কে ? সে তো মাকে দেখতে এসেছে । মা বলে ডাকতে এসেছে । কোনো বিশেষ মতলবে আসেনি । শুধু মাকে একবার চোখের দেখা দেখতে এসেছে । আর জানতে চেয়েছে কেন পেরেন্টরা তাকে ফেলে দিয়েছে ! এই লিয়া তবে কে ?

কী তার আসল পরিচয় ? তার বিদেশী বাবা ও মা তাকে উপযুক্ত শিক্ষায় বড় করেছে , ভালো সংস্কার দিয়েছে কাজেই সে প্রতারক নয় । ঠগ বলে মনে হয়না তার চোখের দিকে তাকিয়ে অথচ তাতুমের মা তার মেয়েকে আগেই ফিরে পেয়েছে ।

এখন যেন স্বস্তি পেলো বিন্দি । বিন্দি মেমসাহেব ।

তার নিজের রক্ত যে তাকে ঠকায়নি , বিট্রে করেনি সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারলো । লিয়াই তার আসল মেয়ে । অন্যজনকে থিওডোর একটি আদিবাসী বস্তি থেকে তুলে আনে । দেখতে অনেকটাই তাতুমের মতন সেই মেয়েকে । তাতুমকে দেখতে তার মায়ের মতন । শ্যামলা, রোগা , উজ্জ্বল মুখশ্রী । একটু বোঁচা

নাক । লিয়াও সেরকমই তবে আরো মিষ্টি তার মুখ । আসলে তার মুখে সারল্য আছে , আছে সততার স্পর্শ । হয়ত তাই একটু বেশী সুন্দর । উজ্জ্বল । প্রায় একই রকম দেখতে বলে শৈশবে ফেলে যাওয়া মেয়েকে চিনতে ভুল করে তার মা । পরে যখন আসল মেয়েকে কাছে পেলো, তখন দেখলো দুই মেয়ের ফটো পাশাপাশি রেখে যে একজন- অন্যজনের হুবহু কপি হলেও লিয়ার মুখে আছে সরলতা আর তাতুমের যার আসল নাম আর জানা যাবেনা , তার দৃষ্টি বাঁকা । মুখে একটা কপট হাসির আভা আর কুচক্রে যে জড়িত আছে তার আভাস মেলে ওর দিকে চাইলেই ।

হয়ত ঘৃণা থেকে একটু বেশি মন্দভাবে ভাবছে তাতুমের সম্পর্কে কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও বিন্দি মেমসাহেব আজ এক গাঢ় বেদনার হাত থেকে এক ঝটকায় মুক্তি পেয়েছে লিয়ার কারণে । আর যাই করুক না কেন তাতুম ; সে যে বিন্দির রক্ত নয় এটা জেনেই মহাখুশি বিন্দি , সরি বিন্দি মেমসাহেব ।

যদিও বুকে করে মানুষ করেছে বলে দু:খ হচ্ছে কিন্তু এইটুকু তো মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই । আর এই কান্ডের মূল কর্তা হল থিওডোর । কাজেই অপরাধের অনেকটা ভাগই তার ওপরে পড়ে ।

তাতুমের কাছে হয়ত এটা সত্য প্রেম কিন্তু থিওর কাছে এটা হল ভ্রমরের ফুল বদল করা ।

একটি নিদারুণ অসুখ আর অন্ধকারে ঢাকা প্রেত মুখ যার হাত থেকে এখন আর চাইলেও সে নিস্কৃতি পাবেনা ।

****

লিয়া ; আসার আগে ভেবেছিলো যে তার মা হয়ত তাকে মারধোর দিয়ে বিদায় করবে অথবা দেখাই করবে না কিন্তু সে তার মায়ের সমস্ত হৃদয় জুড়ে এইভাবে বসবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি ।

আদমের কথাই ঠিক হল । আবেগের সাথে লজিককে কাজে লাগিয়ে । নিজে এসে দেখলো মা কী করে , আবেগের বশে মিথ্যা কিছু কল্পনার ওপরে নির্ভর না করে !

বাবা তো আর নেই, বাবা সংগ্রাম করেছে, যদিও হেরে গেছে তবুও কোনো প্রতিবাদই কিন্তু স্তব্ধ হয়না । আর নকল তাতুমের হবু স্বামীর গল্প শুনে আশ্চর্য তো হলই সাথে সাথে একটা তীব্র ঘৃণায় সমস্ত অন্তর ভরে গেলো । কারণ অনেকেই হয়ত নকল তাতুমকেই লিয়া ভাববে । না জেনে ।সবকিছু তো আর কন্ট্রোল করা যায়না জগতে । কাজেই কেউ কেউ না জেনে ভাববে ,

কেউ কেউ মজা লুটবে ঐ অবৈধ সম্পর্ক থেকে আর কেউবা জানতেও চাইবে না বিন্দুমাত্র সত্য । আর এটাই রূঢ় বাস্তব ।

****

এরপরে লিয়ার সাথে আদমের বিয়ে হল । ওদের সেই **বোমারু-বড়দা, কিথ্** মুক্তি পায় অবসাদগ্রস্ত মানুষ হিসেবে । আইন তাকে ক্ষমা করে দেয় । সেও লিয়া ও আদমের সাথে থাকে ।

বিন্দি, এর বেশ কিছুবছর পরে- হঠাৎ-ই এক বিশেষ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পরপাড়ে চলে যায় ।

নকল তাতুম, নিজের মূর্খামি বুঝতে পারে, সেক্স পাগলা বৃদ্ধ থিওডোর, তার এক বান্ধবীকে কনসিভ্ করালে । তার সাথে বিছানায় ধরে ফেলে একদিন । ওরা তো আগে এমন এক দেশে চলে যায়, যেখানে ওরা বিয়ে করতে পারে ।

মাকে নিয়ে তো সমস্যা হয়নি- কারণ মা নিজেই ওদের ত্যাগ করে যায় । তাতুম জানতে পেরেছিলো তো যে সে বিন্দির নিজের মেয়ে নয় । তবুও থিওডোর ওর

সামাজিক পিতা, তাই ওরা অন্য দেশে চম্পট দেয়, একপ্রকার বাধ্যই হয় ।

তাতুম ও থিওডোরের পুত্র জর্জ থাকে এক হোমে । কারণ সে ইন্টেলেক্চুয়ালি ডিসেবেল্ড্ । যেহেতু থিওডোর আর তাতুম- রক্তের সম্পর্কে বাঁধা নয়, তাই ওদের সন্তান এই কারণে মানে বাবা ও মেয়ের মিলনে এমন হয়েছে তা বলা যায়না তবে দুজনের কেউ একজন তো এই রোগের কণা তার জিনে বহন করছে বলেই লোকে মনে করেছে । জানা যায় যে থিওডোরের বংশে এসব আছে । আর ছেলেটি, যার নাম ওরা দিয়েছে জর্জ (লিও নয় কারণ সে সিংহ না বরং নির্জীব) সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে আর আধো আধো স্বরে মম্ ও পপ্ বলে বটে কিন্তু তাতুমের ওকে দেখলেই নিজের ভুলের কথা মনে পড়ে গিয়ে এক বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটে । মনে হয় ওর গলাটা টিপে ওকে শেষ করে দেয় । হয়ত দেবেও কোনোদিন । কারণ ও তো আর মমতাময়ী নয়, এক সুযোগ সন্ধানী মানুষ যে পাপকে পাশ কাটিয়ে না যেতে পারলে তাকেই আষ্টেপৃষ্টে ধরে আর পাঁচটা বাচালের মতন ।

বন্দী

যুদ্ধ শেষে রাজা বলে

ওহে বন্দী ভায়া ,

জয় উৎসবে আমরা হুইস্কি খাবো

তুমি খাবে কাজু, কী দিয়া ?

ভায়া বলে ঈষৎ হেসে

ওগো ভিনদেশী নরেশ ,

আমি খাবো রক্ত তোমার

কারণ এটাই আমার স্বদেশ !!

শেষ ---